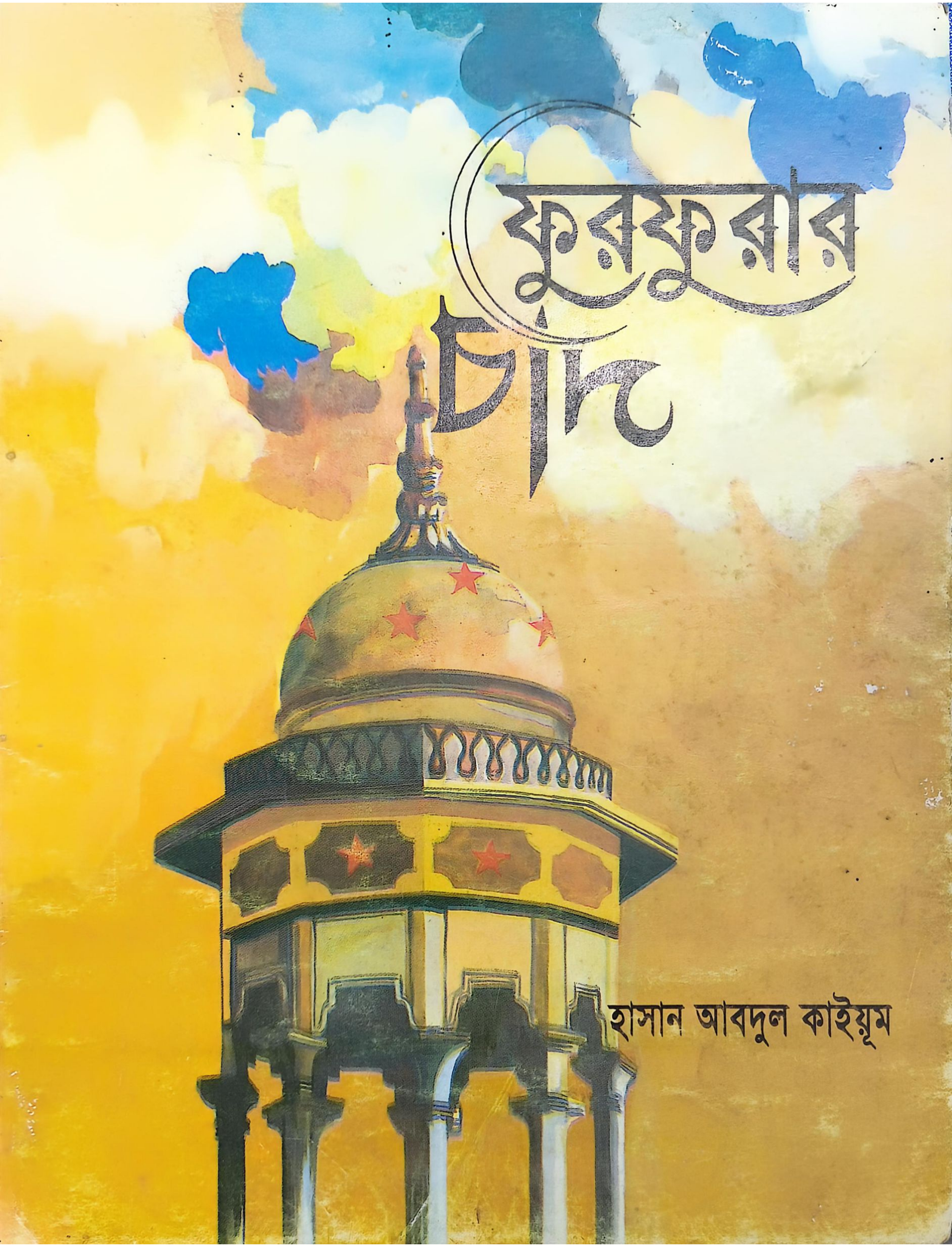

ফুরফুরার
চাঁদ
হাসান আবদুল কাইয়ূম

ফুরফুরার চাঁদ

হাসান আবদুল কাইয়ূম

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ফুরফুরার চাঁদ
হাসান আবদুল কাইয়ূম

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৮৭/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২২.৯৭
ISBN : 984-06-0316—7

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৮০

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ১৯৯৫
আষাঢ় ১৪০২
মুহররম ১৪১৬

প্রকাশক
এম. আতাউর রহমান
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোঃ শামসুজ্জোহা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

মূল্য ঃ ২৭.০০ টাকা

FURFURAR CHAND (Life-sketch of Pir Moulana Abu Bakr siddique (R)) :: written by Hasan Abdul Quayyum in Bengali and published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka—1000. June 1995

Price : Tk 27.00

US Dollar : 1.50

মহাপরিচালকের কথা

ভারতের পশ্চিম বংগের হুগলী জেলার একটি ছোট্ট গ্রামের নাম ফুরফুরা। এই ফুরফুরা কালক্রমে পরিচিতি লাভ করে ফুরফুরা শরীফ নামে। 'ফুরফুরা শরীফ'-এর অর্থ হলো আনন্দমুখর পবিত্র স্থান। এই নামটি সার্থকতা লাভ করেছে ফুরফুরা শরীফের মহান সাধক মশহুর আলিম ও সমাজ সংস্কারক হযরত মওলানা শাহ্ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (র)-এর অবদানে। এখান থেকে তিনি গড়ে তোলেন ইসলামের মহান সংস্কার আন্দোলন। তিনি শিরকের বিরুদ্ধে, খৃষ্টান মিশনারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে, হিন্দু জমিদারদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে জাগরণের সাড়া তোলেন। বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। এতদঞ্চলের আলিম সমাজকে নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসাম। গড়ে তোলেন আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা। একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতেও তাঁর বিচরণ ছিল সুনিবিড়।

এই অসামান্য দরবেশ ও সমাজসংস্কারকের জীবন অবলম্বনে ছোটদের জন্যে 'ফুরফুরার চাঁদ' গ্রন্থটি রচনা করেছেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম। এটি ছোটদের যেমন আনন্দ দেবে তেমনি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে অনুপ্রেরণাও যোগাবে।

গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমীন !

প্রকাশকের কথা

ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (র) উপ-মহাদেশের একজন মশহুর আলিম ও সমাজ সংস্কারক। ইসলামের খিদমতে তাঁর অবদান অসীম। এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনালেখ্য আমাদের শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম 'ফুরফুরার চাঁদ' নামক এই বইটিতে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় খুলনা ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে। এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে জন-মানসের সামনে তুলে ধরার যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছে,—এ তারই অন্তর্ভুক্ত। আমাদের শিশু-কিশোররা এই বইটি পড়ে উপকৃত হবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আমাদের প্রয়াসকে আল্লাহ্ কবূল করুন। আল্লাহ্ হাফিয।

উৎসর্গ

ফুরফুরা শরীফের আলা হযরত মুজাদ্দিদে যামান মাওলানা শাহ্ সূফী আমিরুশ্ শরীয়ত মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহি আলায়হির জীবন-ভিত্তিক ছোটদের জন্য লেখা 'ফুরফুরার চাঁদ' তাঁরই খলীফা আমার আব্বা হুযুর কুত্বুল আলম হযরত মওলানা শাহ্ সূফী তোয়াজ উদ্দীন আহমদ ছাহেব কেবলা রহমাতুল্লাহি আলায়হির দস্ত মুবারকে তুলে দিলাম।

—লেখক

সূচীপত্র



আয় আয় চাঁদ টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা—

আম্মা এ ছড়া গেয়ে ঘুম পাড়ান। ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে খোকা-খুকু। চাঁদের হাসি। খোকা-খুকুর হাসি। সব হাসি যেনো চাঁদে।

চাঁদমুখো খোকা-খুকু চাঁদের দিকে তাকায়। মন যায় তাদের ভরে। খুশি হয়ে আম্মার কোলে হাত নাড়ে। সেও ডাকে চাঁদকে। চাঁদ যেন শান্তি।

ফুরফুরার চাঁদ

চাঁদে রয়েছে এক মনভরা আনন্দ। রয়েছে এক সুখের আমেজ। চাঁদের আলোয় দূর হয়ে যায় রাতের আঁধার। চাঁদের আলোর পরশে বন-বনানীতে নেমে আসে এক অপূর্ব উজ্জ্বলতা। নদীর স্রোতে আসে প্রাণের জোয়ার। এমনি এক মানুষ চাঁদের কথা বলবো।

তোমরা ফুরফুরার নাম শুনে থাকবে হয়তো। ফুরফুরা ভারতে। পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম এই ফুরফুরা। এর ইতিহাস কিন্তু অনেক বড়। এ গ্রামকে ফুরফুরা শরীফ বলে জানে সবাই। ফুরফুরা মানে আনন্দমুখর, আর শরীফ মানে পবিত্র। কোলকাতা থেকে বাইশ মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম। এ গ্রামে এলেন এক মানুষ। এলেন সেই মানুষ চাঁদ।



ফুরফুরার ইতিহাস



এই গ্রামের বিরাট এক ইতিহাস আছে। অনেক-অনেক দিন আগে এই গ্রামের নাম ছিলো বালিয়া-বাসন্তী। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর আমল থেকে বালিয়া-বাসন্তী ফুরফুরা শরীফ নামে পরিচিত হয়। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী এই উপমহাদেশের বেশ নামকরা সুলতান। তাঁর শাসনে এ দেশের মানুষ সুখী। জিনিসপত্রের দাম খুব কম।

নানা দেশের মানুষ তাই এই সময়ে ভারতে আসতে থাকে।

সে কি আজকের কথা ! সেই ১৩০০ খৃস্টাব্দের দুই-এক বছর আগে কিংবা পরের কথা।

এ সময় এখানে এলেন এক কামিল লোক। নাম তাঁর মনসূর বাগদাদী। হযরত মনসূর বাগদাদীর পূর্বপুরুষ খোদ মক্কা শরীফের। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বংশ সিঁড়ির আঠারোতম উত্তরপুরুষ তিনি।

হযরত মনসূর বাগদাদে লেখাপড়া করেন এবং সেখান থেকে তিনি উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। তাই তাঁর নামের সাথে 'বাগদাদী' উপাধি জুড়ে যায়।

হযরত মনসূর বাগদাদী হুগলী জেলার এই অঞ্চলে আসেন এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে। এখানে তখন ছিল সব বিধর্মীদের বাস। যুদ্ধে বিধর্মী রাজা পরাজিত ও নিহত হয়। সমগ্র এলাকায় ইসলামের ঝাণ্ডা উড়তে থাকে। যে এলাকায় যুদ্ধে বিজয় লাভ করে মুসলিম সেনাদল, সেখানকার নামকরণ করা হয় ফুরফুরা শরীফ অর্থাৎ আনন্দমুখর পবিত্র স্থান। এখনো এই এলাকায় চার শহীদের গড়, রাজার গড় সেই যুদ্ধের স্মৃতি বহন করছে।

হযরত মনসূর বাগদাদীর অষ্টম পুরুষ হযরত মুস্তাফা মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনিও মশহুর কামিল লোক। বাদশাহ আওরঙ্গজেব মুগল বাদশাহ। ন্যায়পরায়ণ, দীনদার বাদশাহ্ হিসাবে তিনি মশহুর। তিনি কুরআনে হাফিজ ও হাক্কানী আলিম। তাঁর পুরা নাম আবূ জাফর মুহাম্মদ মহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব আলমগীর। বাদশাহ আওরঙ্গজেব মুস্তাফা মাদানীকে দিতে চাইলেন বাংলাদেশের সুবেদারী। হযরত মুস্তাফা মাদানী রাযী হলেন না।

বললেন ঃ রাজা-বাদশাহ্‌দের ব্যাপার-স্যাপার আমার সইবে না। আমীর-ওমরাগিরি করা আমার দ্বারা হবে না ভাই।

তবুও আওরঙ্গজেব তাঁকে প্রচুর জায়গা-জমি দিলেন ইসলাম প্রচারের সুবিধার্থে। এই মুস্তাফা মাদানীর নামেই মাদানীপুর এলাকার নাম হয়েছে। পরে কালে কালে মাদানীপুর হয়ে গেলো মেদিনীপুর। আজকের পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলা। তা হলে তোমরা বুঝো, ফুরফুরা শরীফ ছোট্ট একটি গ্রাম হলে কি হবে ? এর ইতিহাস অনেক বড়। ফুরফুরার চাঁদকে নিয়ে সে ইতিহাস আরো বড় হয়ে ওঠে।



এক মেহমানে এক সওগাত



আঠারো শ' বায়ান্ন সাল।

ফাল্‌গুন মাস।

গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। লাল আর হলুদের মেলা। বসন্তের সমারোহ চারদিকে। মৃদুমন্দ হাওয়া। মন মাতানো দৃশ্য। মাতোয়ারা সবাই। ঘরে ঘরে বসন্তের আনন্দ।

সেই যে ছোট্ট গ্রাম, যার ইতিহাস অনেক বড়, সেই বসন্তের আনন্দের সাথে যোগ হয় আর এক খুশির খবর।

ফুরফুরার চাঁদ

সূর্য তখনো হাসতে শুরু করেনি। এমনি সময় ওই গ্রামে এলো খুশির সওগাত। নতুন মেহমান এলো। এক শিশুর জন্ম হলো। চাঁদপানা মুখ। আলো ঝলমল, নাদুস-নুদুস চেহারা। আম্মা মুহব্বত-উন-নেসার কোল গেলো জুড়ে। আব্বা আবদুল মুক্তাদিরের বুক গেল ভরে। প্রাণ গেলো জুড়িয়ে।

পাড়া-পড়শী আর আত্মীয়-স্বজনের আনন্দও সীমা ছাড়িয়ে গেলো। সবার মনেই আনন্দ—যেনো ঈদের চাঁদ উঠেছে।

পাড়া-পড়শীরা বলাবলি করে ঃ চাঁদমুখো হবে না কেনো আবদুল মুক্তাদিরের বেটা ? ওকি যে-সে ঘরের ছেলে ! খোদ্ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বংশধর।

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বংশের তিরিশের কোঠায় এই নবজাতক। ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল প্রদীপ।

সবাই বলে ঃ হযরত আবদুল মুক্তাদির পুণ্যবান। নামকরা আলিম। কামিল পীর। তাঁর ঘরে এমন ছেলে হবে না তো হবে কার ঘরে ? শিশুকে নিয়ে বাড়িময় উচ্ছল আনন্দ। ভাবনাও অনেক। কি নাম রাখা যায় খোকামণির! আব্বা আবদুল মুক্তাদির ভাবেন। আম্মা মুসাম্মাৎ মুহব্বতুন্ নেসা ভাবেন। আত্মীয়-স্বজনেরা পরামর্শে বসেন। বহু সলা-পরামর্শের পর ঠিক হলো ছেলের নাম আবূ বকর সিদ্দিকী। বংশের প্রথম চাঁদ ইসলামের প্রথম খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নামে শিশুর নাম রাখা হলো। আকিকা হলো জাঁকজমকের সাথে। আশপাশের দশ গাঁয়ের মানুষ এলো। ছেলেকে দেখে

সবাই খুশি। সবার মুখে চাঁদপানা এই শিশুর কথা। মুখে মুখে ফেরে তার নাম।

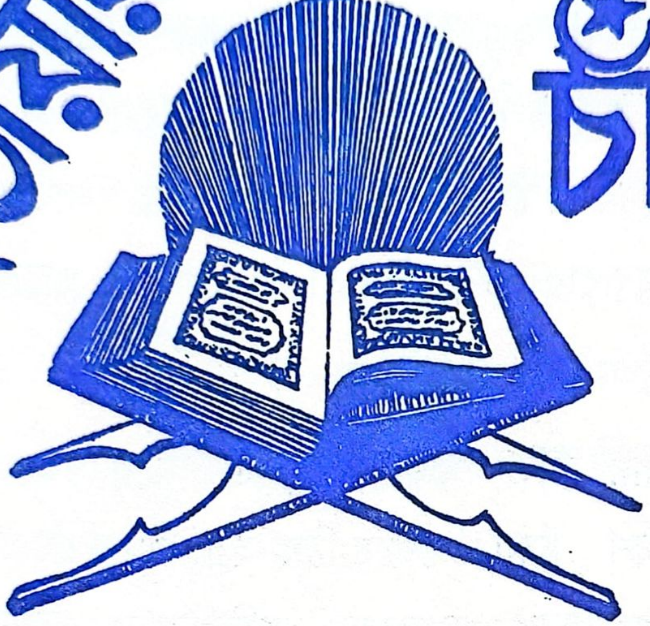
সুখ–দুঃখ সব মিশিয়েই তো জীবন।

আল্লাহ্‌র কি ইচ্ছে। ছেলেটির বয়স তখন ন' মাস। হঠাৎ করে আব্বা ইন্তিকাল করলেন।

আম্মা মুহব্বতুন্ নেসা বুকে আঁকড়ে ধরেন ছেলেকে। মনকে বোঝান ঃ নবীজী জন্মের ছয় মাস পূর্বে বাপ হারিয়েছিলেন। আমার ছেলে তো অন্তত ন'মাস বাপের কোল পেয়েছে। সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছে। ছেলেকে বড় করতে হবে। মানুষ করতে হবে।

আম্মা হাত তুলে মুনাজাত করেন আল্লাহ্‌র দরবারে ঃ হে দয়াময় আল্লাহ্! তুমি মানুষ হবার তৌফিক দাও আমার এতীম ছেলেকে।

দ্বিতীয়ার চাঁদ



দ্বিতীয়ার চাঁদ দেয় আসমানী ছাপ

বুকে তার পূর্ণিমা চাঁদেরই খোয়াব।

আঠারো শ' সাতান্ন সাল।

দেশের তখন পটপরিবর্তন। ইংরেজ রাজত্ব। মুসলমানরা স্বীকার করলো না তাদের। আযাদীপাগল মুসলমানরা শুরু করলো এক লড়াই। ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে। জুলুম আর জালিমের বিরুদ্ধে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

আযাদীর এই লড়াইকে ইংরেজ নাম দিলো সিপাহী বিদ্রোহ। মুসলিম নিধন চালালো তারা বেপরোয়া। মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেবে না মুসলমানদের। মুসলমানদের জীবনে সে এক কালো রাত। সেই দুঃখের দিনগুলোর কথা তোমরা বড় হলে জানতে পারবে।

চাঁদমুখো আবু বকর বড় হয়েছেন। স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে তাঁর, কথা ফোটার সাথে সাথেই ছেলেটা মায়ের মুখে শুনে শুনে কুরআন মজীদের অনেক আয়াত মুখস্থ করে ফেলেছেন। লেখাপড়ার দিকে তাঁর দারুণ ঝোঁক। স্মরণশক্তিও খুব। একবার শুনলেই তা মনে রাখতে পারেন। সবাই তা দেখে অবাক।

ছেলেটিকে কোথায় ভর্তি করা যায়, এ নিয়ে আম্মা ভাবেন। মুরব্বীরা ভাবেন। সলা-পরামর্শ চলে। শেষে ঠিক হয়, গাঁয়ে যে ইংরেজি স্কুল আছে, সেখানেই ভর্তি করতে হবে ছেলেকে। ভর্তি করে দেয়া হলো যথাসময়ে। দুলতে দুলতে ছেলে স্কুলে যাওয়া-আসা শুরু করলো।

কিন্তু ইংরেজি স্কুলে বেশি দিন পড়া হলো না ছেলেটির। একদিন তাঁর আম্মা এক স্বপ্নে দেখলেন ঃ ছেলেকে আরবী পড়াতে হবে। কুরআন-হাদীস শেখাতে হবে। ইসলামের মর্মবাণী তাঁকে শিক্ষা দিতে হবে। দীন-ই-ইলমে পণ্ডিত করে গড়ে তুলতে হবে তাঁকে। এই শিশু হবে ভবিষ্যতে ইসলামের নিশানবরদার। এ যে এক চাঁদ। সে চাঁদকে আলো থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

আম্মা বুঝলেন, এ স্বপ্ন তাঁর জন্য এক ইশারা।

ইংরেজি স্কুলগুলোতে তখন আজকের মতো দীনী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলো না। তাই, ইংরেজি স্কুল থেকে এনে প্রথমে সীতাপুর মাদ্রাসা, পরে হুগলী মুহসিনীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেওয়া হলো। মুহসিনীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন, তা নাম দেখেই বুঝেছো। হ্যাঁ, দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ছিলেন এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। মুহসিন আর তাঁর বোন মন্নুজানের দয়ার কথা কে–না জানে? তাঁরা দয়ার সাগর। তাঁদের দয়ার সীমা নেই।

ছেলেটি বেশ মেধাবী। যা পড়েন, চট্‌পট্‌ তা শিখে ফেলেন। সব পরীক্ষাতেই ফি–বারে প্রথম হন। মাদ্রাসার শিক্ষকরা তাঁকে আদর করেন। যে দেখে সে–ই তাঁকে আদর করে। মুখে তাঁর সব সময় হাসি। অমায়িক ব্যবহার। বেয়াদবী নেই। খারাপ কথা নেই। কাউকে গাল–মন্দ করা নেই। আলাপে–আচরণে দারুণ ভদ্র। মিষ্টি মধুর আখলাক। মুরুব্বীদের সম্মান করেন। ছোটদের স্নেহ করেন।

এমন চাঁদের মতো সুন্দর ছেলেকে কে–না আদর করে।

নামায পড়েন। রোযা রাখেন। কুরআন তিলাওয়াত করেন হররোজ। সুমিষ্ট কন্ঠস্বর।

তাঁর বেশ নামধাম। আব্বা বুযুর্গ ছিলেন, তাই অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে এ ছেলের দিকে। মাঝে–মধ্যে কেউ এসে তাঁর কাছ থেকে দোআ–তাবিজ, পানি পড়া ইত্যাদি নিয়ে যায়।

এ নিয়ে সহপাঠীদের কেউ কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাতে মাঝে মাঝে ছেলেটি দুঃখ পান। একদিন তিনি তাদের বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দেন। এতে তারা মনে খুব ব্যথা পায়। কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বুঝলেন, কাজ হয়েছে। ওষুধে ধরেছে। সহপাঠীদের ডেকে বললেন ঃ আজকাল যে তোমরা আর আমার সাথে কথা-টথা বলো না—ব্যাপার কি ? ছেলেরা বললো ঃ তুমি আমাদের মনে ব্যথা দিয়েছো।

তিনি বললেন ঃ বাঃ, আমি কি তোমাদের কোন কিছু দিয়ে আঘাত করেছি যে তাতে তোমরা ব্যথা পেয়েছো ?

ছেলেদের একজন এগিয়ে এসে বললো ঃ কথার ব্যথাই তো বড় ব্যথা।

তিনি বললেন ঃ যদি কথার আঘাতে মনে এতো ব্যথা পাওয়া যায় তবে কেনো আল্লাহ্‌র কালামে কাজ হবে না। দোআ-তাবিজে কেনো কাজ হবে না।

আল্লাহ্ প্রেমময়। আল্লাহ্‌র কালামে সব সুরাহা হয়। এসো, আমরা তাঁর পাক কালামের কথা স্মরণ করে একজোট হই। মিলে যাই।

সহপাঠীদের ভুল ভাংলো। সবাই এসে মাফ চেয়ে নিলো। তিনি সবাইকে বুকে টেনে নিলেন। কোলাকুলি করলেন। মাদ্রাসার হোস্টেলে থাকেন আবু বকর। মন তাঁর মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায়। ভাবেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে নিয়ে। ভাবেন তাঁর সৃষ্টিরহস্যের কথা। কুদরত আর রহমতের কথা। তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহের কথা। ভাবেন দুনিয়া ও আখিরাতের কথা।

নিগূঢ় সব ভাবনা।

মাঝে মাঝে গভীর রাতে একাকী যান খোলা মাঠে। প্রকৃতির নিভৃত পরিবেশ অবলোকন করেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারা দেখেন। চাঁদ দেখেন। দূর-দিগন্তে পড়ে থাকা আকাশ দেখেন। ভাবেন আর ভাবেন। কি এক আলো যেনো এসে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। জ্যোতির্ময় সে আলো। নূর ভরা সে আলো। অভিভূত হয়ে পড়েন। শেষে ঘরে ফিরে আসেন।

লেখাপড়ায় অসাধারণ।

পড়াশুনায় গাফলতি নেই। কাজে গাফলতি নেই। সময় সম্পর্কে খুব সজাগ। কর্তব্যপরায়ণ। ভালো ছেলে বলে চারদিকে তাঁর নাম।

বয়স কুড়ি বছর। মাদ্রাসার উচ্চ ডিগ্রী জামা'আতে উলা পাস করলেন সুনামের সাথে। ভাল ফল করলেন পরীক্ষায়।

লেখাপড়ার কি শেষ আছে ? জ্ঞান-পিপাসা দারুণ এক পিপাসা। সে পিপাসা তাঁর মিটলো না। কোলকাতা এলেন। কোলকাতার এক বড় মসজিদ। সিন্দুরিয়া পট্টির মসজিদ। এ মসজিদে এক নামকরা আলেম শিক্ষা দেন হাদীস-তফসীর, ফিকাহ্। তাঁর কাছে গেলেন। নাম তাঁর মওলানা হাফেজ জামালুদ্দীন। শহীদ মুজাদ্দিদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর প্রধান শাগরিদ তিনি। মস্তবড় কামেল লোক। তাঁর কাছে নতুন করে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান নিলেন। শিখলেন তফসীর। শিখলেন ফিকাহ্।

জ্ঞানের কি শেষ আছে ! জ্ঞান অর্জন করা ফরয। সব জানতে হবে—শিখতে হবে। শুনলেন, ভালো মান্তেক জানেন মওলানা বেলায়েতী সাহেব। মান্তেক হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা! মওলানা বেলায়েতী থাকেন কোলকাতায় নাখোদা মসজিদে। নাখোদা মানে হচ্ছে জাহাজী। জাহাজীরা এই মসজিদ তুলেছিলো, তাই মসজিদের নাম নাখোদা মসজিদ। খুব বড় মসজিদ। সেই মসজিদে মওলানা বেলায়েতীর কাছে গেলেন তিনি। শিক্ষা নিলেন মওলানা সাহেবের কাছ থেকে মান্তেক। হিকমতও শিখলেন তাঁর কাছে। হিকমত হচ্ছে জ্ঞান–বিজ্ঞান।

জ্ঞান–পিপাসা তাঁর প্রবল। আরো জানতে হবে, আরো শিখতে হবে। জ্ঞান আলো দেখায়। তিনি জ্ঞানের সন্ধানে ছুটে গেলেন মদীনা মনওয়ারায়। মসজিদুন নববীতে। নবীজীর মসজিদে। সেখানে পড়াশোনা করতে লাগলেন মশহুর ওস্তাদের কাছে। নবীজীর রওযা শরীফের মুজাবের হযরত মওলানা শায়খোদ্দৌলা এলেন সৈয়দ আমীন রিজওয়ান–এর কাছে।

কিতাবের পর কিতাব শেষ করলেন। ওস্তাদ খুশি হয়ে সনদ দিলেন। চল্লিশ–খানা হাদীসগ্রন্থের ওপর সনদ পেলেন তিনি।

জাহেরী বিদ্যায় গভীর জ্ঞান অর্জন করার পর তিনি ইলমে তাসাউফ শিক্ষার জন্য অধীর হয়ে ওঠলেন। তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগলো আল্লাহ্‌কে হৃদয়ংগমের জ্ঞান অর্জন করার। বই পড়ে তা জানা যায় না। মনের গভীরতা থেকে তার আওয়ায বের হয়। অনুভবের অতল থেকে আল্লাহ্ প্রেমের

আস্বাদন লাভ করা যায়। লাভ করা যায় আল্লাহ্‌র কুরবত। হাসিল হয় আল্লাহ্‌র নৈকট্য।

পীরের কাছে মুরীদ হয়ে সে জ্ঞান লাভ করতে হয়। কিন্তু পীর হলেই তো হবে না। কতই তো পীর আছে। বিদ'আতী আর ভন্ড পীরও তো রয়েছে অনেক।

যুবক আবু বকর জ্ঞানে পণ্ডিত। তিনি তো আর ভন্ডের কাছে মুরীদ হতে পারেন না। মুরীদ মানে নিজেকে বিকিয়ে দেয়া। শিষ্যত্ব গ্রহণ করা।

খোঁজেন তিনি খাঁটি পীর। কামেল পীর। ছোটোবেলায় পিতা ইন্তিকাল করেছেন। তিনিও ছিলেন হাক্কানী পীর। বেঁচে থাকলে আব্বার কাছেই ইলমে তাসাউফের সবক গ্রহণ করতেন। মা'আরিফাত শিখতে পারতেন। জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর নসিবে তো আর তা হয় নি।

খবর পেলেন মওলানা শাহ সূফী ফতেহ্ আলী রহমাতুল্লাহ আলায়হি একজন কামেল পীর। বাড়ি তাঁর চট্টগ্রাম জেলার আমিরা বাজার। পরে বাড়ি করেন বর্ধমান জেলার পুনাচি গ্রামে। সরকারী চাকুরে। কিন্তু হাক্কানী আলেম ও কামেল সূফী। মরমী ও অনুভূতি জ্ঞানে পন্ডিত। অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি। ভাবের কবিতা। জ্ঞানের কবিতা।

হাজার হাজার মানুষ তাঁর মুরীদ। যে তাঁর কাছে যায় ফিরে আসে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে। যুবক আবু বকর তাঁর কাছে মুরীদ হলেন। পীর হযরত

ফতেহ্ আলী (র) তাঁকে পুত্রের মতো গ্রহণ করলেন। মন ভরে—তাঁকে শিক্ষা দিলেন মা'আরিফাত। ইলমে তাসাউফ। আল্লাহ্‌র জ্ঞান লাভের বিদ্যা। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পূর্ণতা হাসিল করলেন। এবং কামালিয়াত প্রাপ্ত হলেন।

পীর তাঁকে সনদ দিলেন। খিলাফতি দিলেন। প্রতিনিধিত্ব দিলেন। খিলাফতনামা লাভ করলেন তিনি। ইলমে তাসাউফ বা অনুভূতি রহস্যে যাঁরা সর্বোচ্চ মঞ্জিলে উপনীত হয়ে সৃজনীর পরিচয় দেন কেবল তাঁরাই খিলাফতনামা বা সনদপত্র লাভ করেন।

এই প্রতিনিধিগণই পীর নামে অভিহিত। পীর মানে শিক্ষাগুরু। যিনি আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ধাবিত করেন। ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্যে মুরীদকে রঞ্জিত করে দেন।

যুবক আবু বকর নিজ মুরশীদের নির্দেশ ও সনদ পেয়ে ফিরে এলেন নিজ গ্রামে। আসবার সময় পীর হযরত ফতেহ্ আলী (র) তাঁকে বলে দিলেন ঃ বাবা, এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে নানা ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ চলছে। সাধারণ মানুষ বোঝে না। জানে না। কবর পূজা করে। পীর পূজা করে। কবরে ফুল দেয়। পীরকে সিজদাহ করে। যিকিরে নর্তন-কুর্দন করে। গান-বাজনা করে। শির্‌ক, বিদ'আত ও কুফরীতে দেশ ছেয়ে গেছে। এগুলো বন্ধ করতে হবে। সমূলে ধ্বংস করতে হবে। পথের দিশা দিতে হবে সাধারণ মানুষকে। আলোর পথ দেখাতে হবে।

পীর তাঁকে মুহ্ইয়স সুন্নাহ ও আমিরুশ শরীয়ত লকব দিলেন। মুহ্ইয়স সুন্নাহ অর্থ সুন্নতকে যিন্দাকারী আর আমিরুশ শরীয়ত অর্থ শরীয়তের নেতা।

হ্যাঁ, তাঁকে গ্লানি আর কালিমার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হবে। ইসলামের রওশনী ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে—সব মানুষের কাছে।

পূর্ণিমার চাঁদ হাসে

কাজ শুরু হলো পীর আবু বকরের। ফুরফুরার আকাশে চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। শির্‌ক, বিদ'আত ও কুফরীর বিরুদ্ধে সোচ্চার। উঠে পড়ে লেগে গেলেন অনাচার দূর করতে। তাঁর নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

বাংলা-আসাম-উড়িষ্যার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ওয়াজ-নসিহত করে মানুষকে বোঝান। তাদের ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে দেন। কুরআনী যিন্দিগীর পথে সকলকে আহ্‌বান করেন। কণ্ঠ তাঁর মিষ্টি। সুমধুর আর আকর্ষণীয় কণ্ঠ। উদার আর

বুলন্দ আওয়ায। যেনো বজ্রকন্ঠ। জনতা তাঁর কথায় অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরে আসে। সত্যিকার ইসলামের স্বাদ তারা লাভ করে। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর কাছে এসে মুরীদ হয়। নতুন জীবন লাভ করে তারা।

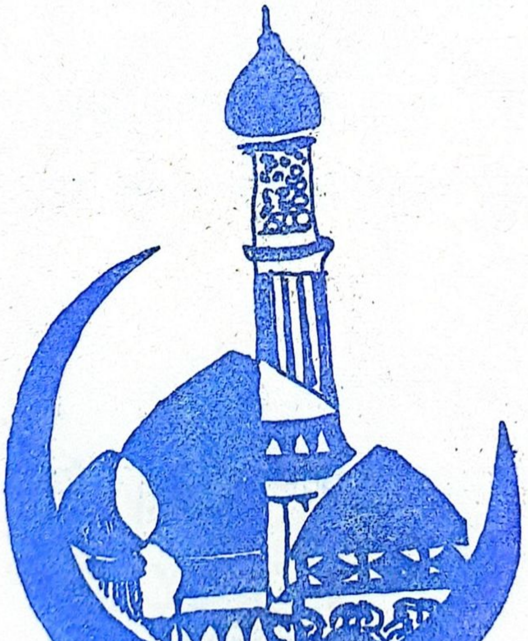
তিনি ওয়াজ করেন। বক্তৃতা করেন। আর সব আলিমের মতো সে ওয়াজে মসনবীর গল্প বলা নেই। সুর করে গযল গাওয়া নেই। কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াজ করেন। ঘন্টার পর ঘন্টা। এক নাগাড়ে ছয়-সাত ঘন্টা। তারও বেশি। হাজার হাজার মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর ওয়াজ শোনে। পিন-পতন নীরবতার সাথে তাঁর ওয়াজ শোনে। সে ওয়াজে কি মোহিনী শক্তি ! শোনা শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুনতে ইচ্ছে করে।

রাত নেই, দিন নেই। খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ আর ইসলামের চিরন্তন শিক্ষা তিনি প্রচার করেন।

রূপকথার সোনার কাঠির পরশে যেমন ঘুমন্তপুরী জেগে ওঠে। হাতীশালে হাতী জাগে। ঘোড়াশালে ঘোড়া জাগে। রাজা জাগে। রাণী জাগে। রাজকন্যে জাগে। সারা রাজ্য জাগে।

তেমনি পীর হযরত আবু বকরের পরশে জেগে ওঠে এ দেশের মুসলমানরা। প্রকৃত ইসলামী যিন্দেগীর দিশারী পেলো তারা। কেঁপে ওঠলো পীর পূজা, কবর পূজার ভিত। শির্‌কী, বিদ'আতী, কুফরী সব কুসংস্কার অবসান হতে

লাগলো। মুখোশ খুলে গেলো অন্যায়ের। মুখোশ খুলে গেলো অবিচারের। ইসলামী হাওয়া বইলো। তিনি মুজাদ্দিদে যামান নামে মশহুর হয়ে গেলেন। মুজাদ্দিদে যামান অর্থ যুগ–সংস্কারক।





মুজাদ্দিদে যামান হযরত মওলানা শাহ্ সূফী পীর আবু বকর। কতো লোক আসে তাঁর কাছে জ্ঞান নিতে, পথ পেতে। আসে কৃষক। আসে শ্রমিক। জ্ঞানী-গুণী। রাজনীতিবিদ। ব্যবসায়ী। বুদ্ধিজীবী। সর্বস্তরের মানুষ। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃস্টান—সবাই আসে।

ফুরফুরায় চাঁদের হাট। এক পবিত্র ভূমি।

দেশের নেতারা আসেন। আসেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। আসেন শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। আসেন মওলানা মুহাম্মদ আলী। মওলানা

শওকত আলী। খাজা নাজিমুদ্দীন। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ চিঠি পাঠান দোআ চেয়ে।

দেশ তখন বৃটিশের অধীন। ইংরেজ খেদানো আন্দোলন চলছে। রাজ–নীতিকরা ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কেবলার দোআ চান। সমর্থন চান। পীর সাহেব রাজনীতিক নন।

দোআ করেন ঃ ন্যায়ের জয় হোক। সত্যের জয় হোক। শান্তি কায়েম হোক। মানুষের দুঃখ দূর হোক।

তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য মানুষকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হেদায়েত করা। পথ দেখানো। কুরআন মজীদ আর হাদীস শরীফের শিক্ষায় মানুষকে উদ্ভাসিত করা।

গড়ে তোলেন এক সমিতি। বাংলা ও আসামের আলিমদের নিয়ে গড়ে ওঠে সে সমিতি। জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসাম। সভাপতি তিনি নিজে। গড়ে তোলেন আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা।

সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জুলুম আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমিতি প্রতিবাদ জানায়। রুখে দাঁড়ায়।

শুধু প্রতিবাদ করলেই তো হবে না, প্রচারও চাই। লোককে বুঝাতে হবে– ইসলাম কি ? সত্য পথ কোন্‌টা ? কোন্ পথে মুক্তি ? এর জন্য দরকার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। তাই গঠন করেন আর এক সমিতি। সে সমিতি সব ওয়ায়েজীনকে নিয়ে। ওয়ায়েজীন অর্থ বক্তাগণ। বক্তাদের এই সমিতির নাম আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন।

আঞ্জুমানের মুখপত্র 'ইসলাম দর্শন' প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় আল-ইসলাম। আল-ইসলামের সম্পাদক মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। সহ-সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

মওলানা মুনিরুজ্জামানের কলম চলে আগুনের মতো। পীর হযরত আবু বকরের নির্দেশে তিনি লেখেন। ইসলামের ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার, আদর্শ, উদারতা, সব ফুটে ওঠে আল-ইসলামের পাতায় পাতায়। মুসলমানদের সমস্যা ও সমাধান এক সাথে বেরোয় মাসিক আল-ইসলামে।

ভালো-মন্দের ব্যবধান বেরোয়। খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দেয়া হয়। মসলা-মাসায়েল বেরোয়। এক একটা লেখা যেনো এক একটা আগুনের ফুলকি। অন্যায়-অবিচার খতম হয়।

মুসলমানদের জীবনে আসে জোয়ার। ভুল যায় দূর হয়ে। সত্য হয় প্রতিষ্ঠিত। সব দিকে আলোর ঝলকানি।

জ্ঞানের রাজ্যে প্রবল আলোড়ন এনে দেন হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র)।

গণ-জীবনে জীবনের আলো জ্বালিয়ে দেন। মুসলমানদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন।

শুধু কি 'আল-ইসলাম' আর 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকা বেরোয় ? তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়, উদ্যোগে, উৎসাহ আর দানে বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা বের হয় বাংলা ভাষায়। বের হয় মিহির-সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, নবনূর,

মোসলেম হিতৈষী, হানাফী, মোহাম্মদী শরিয়ত, শরিয়তে ইসলাম, সুন্নতে আল্ জামায়াত, হেদায়াত, সোলতান এমনি কতো পত্রিকা।

তাহলে বোঝো, সেই ইংরেজ আমলে মুসলমানদের এতোগুলো পত্রিকা বেরিয়েছিলো। পীর হযরত আবু বকর ছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিলো।

সেকালে যতো ইসলামী পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ বেরিয়েছে, তার প্রায়গুলোরই উৎসাহদাতা তিনি। নিজেও কয়েকখানা বই লেখেন। তাঁর পুত্র মওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁরই উৎসাহে বেশ কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়াও, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কুরআন মজীদের তরজমা করেন। কবি গোলাম মুস্তফা বিশ্বনবী লেখেন তাঁরই উৎসাহে।

সমাজের জন্য তাঁর দরদের কি শেষ আছে। সারা দেশের নানা জায়গায় স্থাপন করেন অসংখ্য মাদ্রাসা। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ মাদ্রাসা শর্ষিণা মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা তাঁরই খলীফা পীর নেছার উদ্দীন। বাংলা-দেশের প্রায় সবগুলো মাদ্রাসাই পীর আবু বকর (র)-এর কীর্তি।

একবার ইংরেজ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষায় সরকারী সাহায্য বন্ধ করার চেষ্টা করলো। পীর আবু বকরের কণ্ঠে সোচ্চার প্রতিবাদ ওঠলো। ইংরেজ সরকার সিদ্ধান্ত বদলালো। আবার অনুদান দেওয়া শুরু হলো।

তিনি মুসলিম শিক্ষা বোর্ডের উপদেষ্টা সদস্য। সরকারী টেক্সট বুক বোর্ডের সদস্য। আর এসব সদস্য হবার প্রস্তাব তাঁকে সরকারই দেয়। তিনি রাযী হন। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁর সদস্য হওয়াও প্রয়োজন ছিলো।

তিনি নিজ গ্রামে হাসপাতাল, মাদ্রাসা, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব পুরুষদের থেকে পাওয়া তাঁর প্রচুর সম্পত্তি। সেই আওরঙ্গজেবের আমল থেকে। আয়মা-লাখিরাজ শত শত বিঘা জমির মালিক তিনি। তাঁর সব আয় জনগণের কল্যাণে। মুসলমানদের জন্যে দীল খুলে ব্যয় করেন। আনন্দ পান মানুষের মুখে হাসি দেখে। মানুষের জীবনে কান্নাভরা অবস্থা তিনি চান না। তাদের জন্যে হৃদয় নিংড়ানো তাঁর ভালবাসা।

মেয়ে বিয়ে দিতে পারছে না মেয়ের বাপ। টাকার অভাব। পীর আবু বকরের কাছে গেলো খবর। পীর আবু বকর দিয়ে দেন টাকা।

গরীব পিতা পুত্রকে পড়াতে পারছে না। বই কেনার টাকার অভাব। পীর আবু বকর বইয়ের দাম দিয়ে দেন। এমনিভাবে অভাবী মানুষের জন্য তাঁর দানের হাত খোলা। মুক্তহস্ত মানুষ। উদার হাতে অকাতরে বিলিয়ে দেন সব।

১৩২৬ বাংলা সনের আশ্বিনের ঝড়ে ভেংগে চুরমার হয়েছে কত ঘর-বাড়ি-দালান-কোঠা। অসহায় মানুষ পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে ছুটে যান মানব-দরদী পীর আবু বকর (র)। পঞ্চাশ হাজার টাকা বিলিয়ে দেন অসহায় মানুষের মধ্যে।

খিলাফত আন্দোলন। তুরস্কে যুদ্ধ চলছে। এ দেশের মুসলমানরা খিলাফত রক্ষায় তুরস্কের মুসলমানদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে। করবেই বা না কেনো ? নানা ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে খিলাফতের পিদিম জ্বলছে তুরস্কে। তাকে রক্ষা করতে হবে। তুরস্কের বলকানে এই নিয়ে বেঁধেছে যুদ্ধ। পীর

হযরত আবু বকর সেখানেও ষাট হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন দুস্থ সৈনিকদের জন্যে।

একবার হয়েছে কি, জানো ? কলকাতার এক মসজিদের সামনে হিন্দুরা ঢোল বাজিয়ে যাচ্ছিলো। নামাযের সময় ছিলো তখন। মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে বাজনা বাজাতে নিষেধ করলো কয়েকজন। আর কি? এই নিয়ে বেঁধে গেলো ভীষণ গণ্ডগোল। বেঁধে গেলো মারামারি খুনাখুনি। ইংরেজ সৈন্য এলো সেই গণ্ডগোল থামাতে। শেরে বাংলা তখন মন্ত্রী। তিনিও এলেন। পীর আবু বকর এলেন। জানলেন, খোঁজ–খবর নিলেন। দেখলেন, হিন্দুরা ইচ্ছে করেই এ গণ্ডগোল বাঁধিয়েছে।

পীর আবু বকর এ নিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানালেন। শেষে এক বৈঠক ডাকলেন গভর্নর। সারা ভারতের নেতারা এলেন। শেরে বাংলা এলেন, গান্ধীও এলেন, পীর আবু বকরকেও ডাকা হলো। তিনিও এলেন।

সারা বৃটিশ ভারতের নানা এলাকা থেকে বহু দেশ নেতা এলেন।

বৈঠক শুরু হলো। কথাবার্তা চলছে ইংরেজিতে। যাঁর যাঁর কথা রাখছেন ইংরেজিতে। পীর হযরত আবু বকর বললেন ঃ আমি কি ইংরেজি জানি ? হয় আমাকে আমার মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতে দেওয়া হোক, কিংবা উর্দুতে বলার সুযোগ দেয়া হোক।

গভর্নর উর্দুতে কথা বলার সুযোগ দিলেন। পীর সাহেব কেবল শেখ সাদীর একটি ফারসী কবিতা আবৃত্তি করলেন প্রথমে। যার অর্থ ঃ গাছকে যদি রাজা ধরি, শিকড় হচ্ছে তার প্রজা। গাছ শিকড়ের জোরেই বেঁচে থাকে।

তেমনি ভারতে ইংরেজ রাজত্বকে যদি একটি গাছ ধরা যায়, তা হলে এ গাছের শিকড় তিনটি। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান। সমানভাবে এই তিন শিকড়কে যদি দেখা না হয়, তা হলে ইংরেজ রাজত্বরূপী গাছ উপড়ে যাবে। ধ্বংস অনিবার্য। পীর হযরত আবু বকরের যুক্তিযুক্ত এই কথা শুনে ইংরেজ সরকার থ' বনে গেলেন।

সভার সবাই সায় দিলেন ঃ হ্যাঁ, পীর সাহেব কেবলা ঠিকই বলেছেন। যথার্থ বলেছেন।

সরকার এর পর থেকে আইন করে মসজিদের সামনে বাদ্য-বাজনা বন্ধ করে দিলেন।

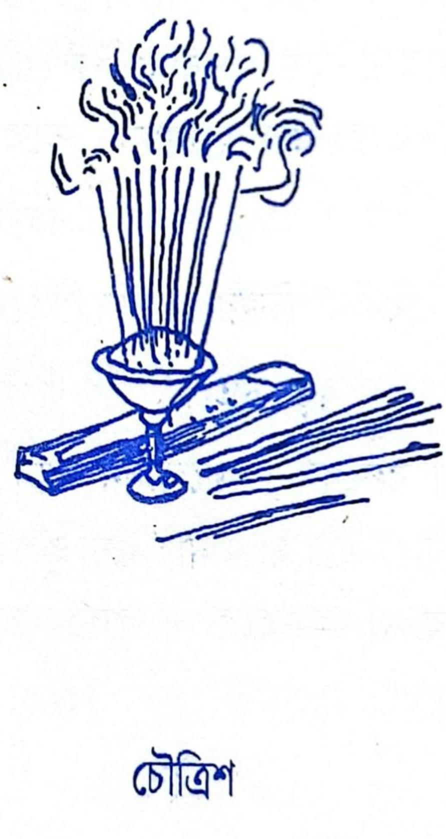
১৯২০ সাল। সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজদের সাথে কেউ সহযোগিতা করবে না। অফিসে কেউ যাবে না। স্কুল-মাদ্রাসায় কেউ যাবে না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ যাবে না। বিলেতী কিছু কেউ ব্যবহার করবে না। এই পণ নিয়ে নেতারা এক হয়েছেন। তবে পীর হযরত আবু বকরের সমর্থন চাই।

তাঁর কাছে এলেন একদিন চিত্তরঞ্জন দাস। এলেন মহাত্মা গান্ধী। মওলানা মুহাম্মদ আলী। সবাই দেশের বড় নেতা।

পীর সাহেব কেবলা বললেন ঃ আন্দোলন মানি। কিন্তু ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় যাবে না, এটা মানি না। ওরা স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় না গেলে ক্ষতি ইংরেজদের হবে না — হবে আমাদের। লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না।

মওলানা মুহাম্মদ আলীকে গোপনে বললেন ঃ মনে রাখতে হবে আমরা প্রথমে মুসলমান। পরে অন্য কিছু। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় ক্ষতি হয় এমন কিছু করা ঠিক হবে না।

তিনি মানুষের বন্ধু। হৃদয় তাঁর বিশাল। আকাশের মতো উদার। ছোটোবড় সবার প্রতি তাঁর সমান নযর। যেখানে যান অল্প সময়ের মধ্যে সবাই তাঁর আপনজন হয়ে যায়।



চাঁদের আলোর রৌশনীতে

পীর হযরত মওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকীর লক্ষ লক্ষ মুরীদ। শত শত খলীফা বাংলাদেশে, ভারতে, আরবে।

দেশ-বিদেশে আজও তাঁর অসংখ্য ভক্ত।

শর্ষিণার পীর মওলানা নেসারুদ্দীন আহমদ তাঁর খলীফা, তাঁর প্রতিনিধি।

অনেক ভাষার পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর খলীফা।

মওলানা রুহুল আমীন তাঁর খলীফা। যশোরের দ্বারিয়াপুরের পীর মওলানা তোয়াজউদ্দীন আহমদ (র) তাঁর খলীফা। কুমিল্লার পীর প্রফেসর আবদুল খালেক তাঁর খলীফা।

তাঁর পাঁচ পুত্র। হযরত মওলানা আবু নসর মুহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী, হযরত মওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ অজীহুদ্দীন মুস্তফা সিদ্দিকী, হযরত মওলানা আবদুল কাদের সিদ্দিকী, হযরত মওলানা নজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী, হযরত মওলানা জুলফিকার আলী সিদ্দিকী–এঁরা সকলেই তাঁর খলীফা।

এমনি শত শত খলীফা তাঁর। তাঁরাও এক একজন মস্তবড়ো পীর। হাক্কানী পীর। লক্ষ লক্ষ মুরীদ তাঁদের। পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী পীরদেরও পীর। শায়খুল মাশায়েখ।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নাম কে না জানে ! এই মহা পণ্ডিত লিখেছেন ঃ হুযুরের তাওয়াজ্জুহ আমার সফলতার কারণ।

তাওয়াজ্জুহ হচ্ছে আত্মিক প্রেরণা। আধ্যাত্মিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পীর মুরীদকে শিক্ষা দেন এক ঐশী শক্তি দিয়ে। সে শক্তি দেখা যায় না, বলা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। যেমন আমরা বাতাস অনুভব করি। জোরে বইলে ঝড় আসে। কিন্তু বাতাস কি দেখা যায় ? অথচ বোঝা যায়। বাতাসের কত শক্তি—তাই না ? পীর তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান তাওয়াজ্জুহর মাধ্যমে যাকে দেন, সে–ই কেবল বোঝে–অনুভব করে।

পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র)–এর সংস্পর্শে এসে সাধারণ মানুষও আল্লাহ্‌র ওলী হয়ে গেছেন।

ফুরফুরার চাঁদ

চট্টগ্রাম জেলার নবীন চন্দ্র সেন নামকরা লোক। বড়ো কবি। মশহুর উকিল। তাঁর এক ভাগ্নে—নাম তার প্রতাপ চন্দ্র সেন। প্রতাপের হলো ভীষণ অসুখ। কতো ওষুধ-পথ্য করা হলো। রোগ তার সারে না। শেষে এক দরবেশের দোআয় প্রতাপের রোগ ভালো হয়ে গেলো। এতো ডাক্তার, এতো ওষুধ, সাধু-সন্ন্যাসীদের টোটকা, ঝাড়-ফুঁক কোনো কিছুতেই যে রোগ ভালো হয়নি—তা ভালো হয়ে গেলো কিনা এক দরবেশের দোআয়। প্রতাপের মনে দীন ইসলামের প্রতি টান এলো। প্রতাপ তখন এন্ট্রান্সের ছাত্র। আজকের দশম শ্রেণী, তখনকার এন্ট্রান্স। বয়সই বা কতো তার। পনেরো কি ষোলো। দরবেশের দোআয় প্রতাপ এন্ট্রান্স পাস করলেন।

একদিন দরবেশ ইন্তিকাল করলেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রতাপকে বলে গেলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে। মুসলমান হতে। পীরের কাছে মুরীদ হবার তাগীদও দিয়ে গেলেন তিনি।

যে দরবেশের দোআয় প্রতাপের মারাত্মক রোগ ভালো হয়ে গেলো, যাঁর পরশে সুস্থ হয়ে উঠলো, তাঁর শেষ নসিহত কি ভোলা যায় ?

মনে তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো প্রতাপের। প্রতাপ ভাবেন আর ভাবেন ঃ

না জানি ইসলাম কতো সুন্দর ধর্ম। এই ধর্মের পথে থেকেই তো দরবেশ সাহেব অতো ভালো মানুষ হতে পেরেছিলেন। যে ধর্মের পরশের ফলে মুখের ফুঁয়ে বড়ো বড়ো রোগ ভালো হয়। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা যায়।

প্রতাপ জমিদারের ছেলে। বাড়িতে বিরাট বিরাট দালানকোঠা। চাকর-বাকর, আরাম-আয়েশ, টাকা-কড়ি, কিছুই ভালো লাগে না তার। দরবেশের কথা মনে হয়। সামাজিক বাধার কথাও মনে হয়। চিন্তায় পড়ে যান প্রতাপ।

যতোই চিন্তা করেন, ইসলামের প্রতি ততই আকৃষ্ট হন। একদিন ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে স্বপ্নে দেখেন। দেখে মন যায় ভরে। ভয় যায় পালিয়ে। ভাবনা যায় দূর হয়ে।

প্রতাপ কলেমা পড়ে মুসলমান হন। মুসলমানী নাম রাখেন আবদুল মোমেন।

দরবেশ বলেছিলেন মুসলমান হতে আর পীর ধরতে। মুসলমান তো হয়েছেন। মুরীদ হওয়া শুধু বাকি।

পীর কোথায় ?

আবার ভাবনা। লোকের মুখে শোনেন ফুরফুরা শরীফের কথা। হাজার হাজার মানুষকে যেতে দেখেন ফুরফুরার পীরের দরবারে। পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র) মশহুর পীর। কামেল হাক্কানী পীর।

প্রতাপ চন্দ্র স্বপ্নেও দেখলেন যেনো মুরীদ হচ্ছেন ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের কাছে।

একদিন তিনি এলেন পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.)-র কাছে। তাঁর হাতে হাত রেখে মুরীদ হলেন। পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র) তাঁকে মন ঢেলে তাসাওউফ শিক্ষা দিলেন। পীরের নির্দেশে তিনি চলে গেলেন শ্যাম দেশের জংগলে। বসলেন ধ্যানে। মুরাকাবায়। কঠিন সাধনায়। সবাইকে এই সাধনায় বসতে দেন না পীর আবু বকর (র)।

ইসলাম তো আর বৈরাগ্যের ধর্ম না। সংসার ছেড়ে জংগলে গিয়ে ইবাদত করার ধর্ম না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কেবল

এই ধ্যান ব্যবস্থা। বলখের রাজা ইবরাহীম আদহামও বেশ কয়েক বছর নির্জন পাহাড়ের গুহায় এই ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

আবদুল মোমেন ধ্যানে বসলেন। মুরাকাবায় আসীন হলেন। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম সব গেলো পালিয়ে। কল্বের দিকে খেয়াল করে তিনি যিকির করতে লাগলেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মকসুদা নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো বন্ধু নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো অস্তিত্ব নেই। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ্। লা মকসুদা ইল্লাল্লাহ্। লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ্। লা মাওযুদা ইল্লাল্লাহ্।

দিন যায়, রাত আসে।

এক শীত যায়, আর এক শীত আসে।

আবদুল মোমেন যিকির করেই চলেছেন। এমনি করে বেশ কয়েক বছর চলে গেলো। অবাক কাণ্ড, তাই না ?

আল্লাহ্র পথের পথিক যাঁরা তাঁদেরকে সময় আটকাতে পারে না।

একদিন একদল শিকারী আবদুল মোমেনকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে। তাঁর ধ্যান ভেংগে যায়।

ফিরে আসেন তিনি তাঁর পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র)-র দরবারে। পীর কেবলা দোআ করেন। খিলাফতী দেন। আবদুল মোমেন সূফী শ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত হন। মস্তো বড় পীর হন। কামেল পীর।

পূর্ণিমার একটি চাঁদ আদর্শ

পীর হযরত মওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (র) একটি আদর্শ, একটি আন্দোলন। ইসলামের উজ্জ্বল প্রতীক।

একবার তিনি যান দিল্লীতে। যিয়ারত করেন হযরত বাকীবিল্লাহ্ (র)-র মাযার। হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-র মাযার। হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র)-র মাযার।

দিল্লীতে বিরাট এক জনসভায় ওয়াজ করেন। তারপর সেখান থেকে আজমীর। হযরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশ্‌তী (র)-র মাযার যিয়ারত করেন। খাজার মাযারে ফুল দেয়া, সিজদা করা, চুমু দেয়া—এসব দেখে প্রতিবাদ করেন। উপস্থিত জনগণকে বোঝান। এসব যে শেরেকী। আল্লাহ্ ছাড়া কারো সিজদা করা যায় না। ফুল দেয়া পাপ—পূজার শামিল।

আজমীর শরীফ থেকে আসেন সারহিন্দ শরীফ। এখানে মুযাদ্দিদে আলাফে-সানীর মাযারের প্রধান খাদেম পীর আবু বকরের মাথায় পরিয়ে দেন মুজাদ্দিদিয়াতের টুপী।

যুগ-সংস্কারের স্বীকৃতি পান তিনি। প্রধান খাদিম জানান ঃ হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী আপনাকে এই টুপী পরিয়ে দিতে বলেছেন স্বপ্নে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ সময় সেখানে ছিলেন। তোমরা এ কাহিনী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'ইসলাম প্রসংগ' বইখানিতে পাবে।

পীর হযরত আবু বকর (র) অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করেন। ইসলাম বিরোধী কিছু দেখলে প্রতিবাদ করেন। একটুও দমেন না। বজ্রকণ্ঠে আওয়ায তোলেন।

একবার ইংরেজ সরকার সারদা বিল ও ওয়াক্‌ফ বিল নামে দুটো আইন এ দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়। এই আইন দুটো ছিলো ইসলাম বিরোধী। মুসলমানরা তা মেনে নিতে পারে না।

পীর হযরত আবু বকর (র) রুখে দাঁড়ালেন। কোলকাতার গড়ের মাঠে বিরাট এক জনসভায় তিনি সিংহের মতো গর্জে ওঠলেন ঃ ডাইনে আমার কুরআন

মজীদ, বামে আমার হাদীস শরীফ। সামনে রাজ-আইন। কুরআন এবং হাদীসের পরিপন্থী কোনো রাজ-আইন মুসলমানরা গ্রহণ করবে না। গ্রহণ করতে পারে না। আবু বকর আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।—কতো বড়ো বুকের জোর থাকলে এ কথা বলা যায় বলতো তোমরা। তাই তো তিনি একজন মহান যুগনায়ক, যুগস্রষ্টা, যুগসংস্কারক।



ফুরফুরা শরীফের ইসালে সওয়াব

ফুরফুরার ইসালে সওয়াব। বার্ষিক সভা। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে এ সভায়। নানা দেশের মানুষ আসে। ফাল্গুন মাসের একুশ, বাইশ, তেইশ এই তিন দিন ধরে সভা চলে।

শুধু মুসলমানরাই কি এই সভায় আসে? না, সব ধর্মের মানুষ সেখানে গিয়ে জড়ো হয়—ভালো কথা শোনার জন্য। উপদেশ শোনার জন্য।

অন্যান্য জায়গার উরসের মতো সেখানে কোনো অন্যায় হয় না। বেশরা কাজ হয় না। ইসলামবিরোধী কাজ হয় না। বড়ো বড়ো গেট আর বিরাট বিরাট গরু-উটের প্রদর্শনী নেই সেখানে। মানুষ এখানে এসে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথা শোনে। যিকির-আযকার করে। গান-বাজনা নেই। নর্তন-কুর্দন নেই।

নানা দেশের সেরা সেরা আলিম-উলামা ওয়াজ-নসিহত করেন। এ সভা যেনো বিরাট এক খোলা বিশ্ববিদ্যালয়। আর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যমণি ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলা।

তিনি গ্যাট হয়ে বসে থাকেন না। এতো লোকের তদারক করেন নিজে। থাকার ব্যবস্থা, খাবার ব্যবস্থা, যাবতীয় ব্যবস্থা সরেযমিনে নিজে দেখাশোনা করেন। আবার সভামঞ্চে গিয়ে ওয়াজ-নসিহত করেন। তালীম-তালকীন দেন। অবাক কান্ড !

একবার ইসালে সওয়াবের দিন। তাঁর এক মেয়ে ইন্তিকাল করলেন। তিনি তখন লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ির ভেতর থেকে খবর এলো কন্যার মৃত্যুর। তিনি শুনে বললেন ঃ ওর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করো। এক কন্যা গেছে, আর আমার হাজার হাজার সন্তান রয়েছে। কতো বড়ো প্রাণ। এতো বড়ো শোকের খবর তাঁকে একটুও টলালো না।

জনগণের মংগলের জন্য যাঁর হৃদয় খোলা, তিনি কি নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন? না—পারেন না।



সেই যে চাঁদমুখো শিশু। দিনে দিনে পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয়েছেন।

পূর্ণিমার চাঁদ। তাঁর জ্যোছনায় সারা দেশ আলোকিত হয়েছে। তাঁর নাম এখন সর্বত্র।

কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ কি অটুট থাকে ? নিঃশেষে প্রাণভরে আলো বিতরণ করে সেও অস্ত যায়।

ফুরফুরার চাঁদ

অস্ত গেলেন পীর হযরত আবু বকরও। সারা দেশ ঘুরে ঘুরে মানুষকে হিদায়ত করেছেন। শরীরের প্রতি খেয়াল নেই। বেশ কিছুদিন থেকেই শরীর ভেংগে পড়েছে। শয্যাশায়ী হয়েছেন। তবুও বিশ্রাম নেই। লোকের ভিড় লেগেই আছে।

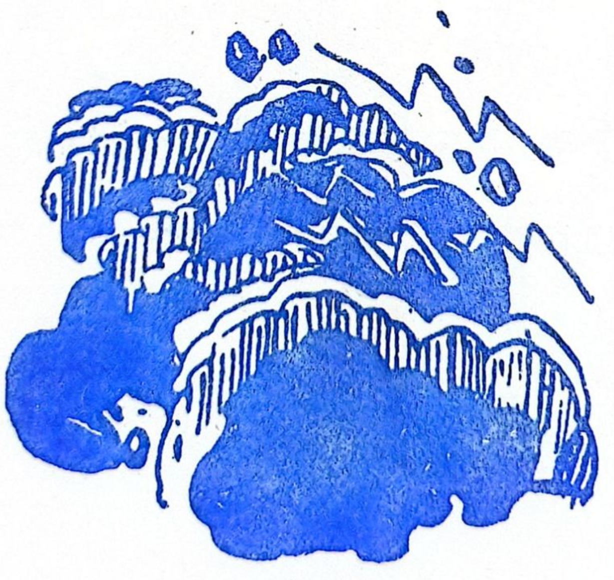
একদিন।

বাংলা তেরো শ' পঁয়তাল্লিশ সালের তেশরা চৈত্র। উনিশ শ' উনচল্লিশ সালের ১৭ই মার্চ।

শুক্রবার সোবেহ্ সাদেক। মসজিদে আযান হচ্ছে। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ঃ হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্। হাইয়া আলাল ফালাহ্। নামাযের জন্য এসো, মংগলের জন্য এসো।

পীর হযরত আবু বকর (র) তখন আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকিরে মশগুল।

আযান শেষ হলো। যিকিরও বন্ধ হলো। সবাই দেখলো—চাঁদ ডুবে গেছে।



চাঁদের স্মৃতি

চাঁদ ডুবে যায়, রেখে যায় আলোর স্মৃতি। নতুন চাঁদের আলোয় আবার জাগে আলোড়ন।

তাঁর পুত্ররা। পুত্রের পুত্ররা। তাঁর খলীফারা, খলীফার পুত্ররা, তাঁর পথ ধরে আলো ছড়িয়ে চলছে আজও।

সিল্‌সিলায়ে ফুরফুরা শরীফ আজ এক আন্দোলন।

ফুরফুরার চাঁদ—যিন্দাবাদ।

পরিচিতি সংক্ষেপ

১. ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (র) একজন হাক্কানী আলিম, কামিল ওলী ও প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক।

২. জন্ম ঃ বাংলা ১২৫৯ সনের ফাল্গুন মাস।
মৃত্যু ঃ বাংলা ১৩৪৫ সনের ৩রা চৈত্র।

৩. ব্যাপক তাঁর কর্মতৎপরতা সারা উপমহাদেশে। এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

৪. ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহু তা'আলা আনহুর তিনি ত্রিশতম বংশধর।

৫. লেখাপড়া ঃ নিজ গ্রাম, হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসা, কোলকাতা, মক্কা-মুয়াজ্জমা ও মদীনা মনওয়ারায়, মদীনা থেকে চল্লিশটি হাদীস গ্রন্থের সনদপ্রাপ্ত।

৬. হযরত মওলানা শাহ সূফী ফতেহ আলী (র)-র দস্তে বয়াত। মারেফাতের তালিম গ্রহণ। ইলমে তাসাওউফের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ। খিলাফত লাভ।

৭. সমাজ সেবার ব্রত গ্রহণ। বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মাদ্রাসা-মক্তব, আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা, ওয়াজ-নসিহত। পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা, দান-খয়রাত।

৮. লক্ষ লক্ষ মুরীদ সারাদেশে। দেশের বাইরেও অসংখ্য মুরীদ, বহু খলীফা।

ইফাবা -৯৪-৯৫, প্র/৫৪৯৭ (উ)—৩২৫০

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ